যেমন দেখেছি আমার বাবাকে

মিজানুর রহমান তরুণ

পূর্বের সংখ্যার পর – – – (আগের লেখাটি পড়তে এখানে টোকামারুন)

বিংশ শতকের ষাটের দশকে পূর্ব বাংলার প্রায় প্রতিটি অঞ্চলে ভয়াবহ বন্যা হয়েছিল। সারা দেশের মানুষ তখন এক কাতারে। যেমন ছিল একাত্তরে।

আমাদের স্কুল থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বন্যার্তদের সাহায্য সংগ্রহের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। স্কুলের ছোট-বড় দু'শতাধিক ছাত্র গান গেয়ে জেলা শহরের প্রধান সড়কগুলিতে ঘুরে ঘুরে সাহায্য সংগ্রহ করেছিলাম। গানটি ছিলঃ

ভিক্ষা দাওহে, ভিক্ষা দাওহে

ভিক্ষা দাওহে মহৎ প্রাণ

বন্যাকবলে ভেসেছে যারা

অসহায় তারা, করহে ত্রাণ॥

প্রাণস্পর্শী সুরে বাঁধা এ গান সমস্বরে গাইতে গাইতে যখন আমরা রাস্তা দিয়ে ধীরে ধীরে এগুচ্ছিলাম, তখন পথচারী, দোকানপাট ও বাড়ীঘর থেকে ছেলেমেয়ে এমনকি গৃহবধুরা এসে সাহায্য সংগ্রহে নিয়োজিত ছাত্রদের থলিতে নগদ অর্থ, চাল-ডাল, কাঁসা-পিতলের বাসনপত্র—এমনকি স্বর্ণের গহনাপর্যন্ত দান করে যাচ্ছিল। আব্বার ডাক্তারখানার সম্মুখে যখন আমরা— আমি ও আরো দু'জন স্কুল সহপাঠী ছিলাম মিছিলের অগ্রভাগে, সমবেত গানের প্রধান ত্রয়ি কন্ঠী হিসাবে। সেদিন দেখেছিলাম আব্বার চোখ জ্বল জ্বল করছে গর্বের আনন্দে। ডাক্তারখানায় আসা রোগী বন্ধুদের তো বলেছিলেনই, আবার বাড়ীতে এসে সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলেছিলেন, "আমার ছেলে মানুষের সেবায় রাজপথে।" আমরা একটু ভাল কিছু করলেই আব্বা 'আমার ছেলে' 'আমার মেয়ে' বলে সবাইকে কথাটা শোনাতেন। "মা" ও কাজের খালা আমর আব্বার কথা শুনে মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসতেন।

আমার সহোদর ভাই একটু বেশী ডানপিটে স্বভাবের ছিল। প্রায়ই প্রতিবেশী ছেলেদের মারধোর করে বাড়ী ফিরত। মাঝে মধয়ে কেউ কেউ নালিশ করতে এলে, আব্বা মা-কে শুনিয়ে বলতেন, "ঐ দেখ, তোমার ছেলের কান্ড!"

জীবন পালনে ও জীবন গঠনে মা-বাবার ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ— এ কথা সবাই জানে। আব্বাই পরপকালে চলে গেলেন। কাকে অবলম্বন করে জীবন গঠন করব! আমি যা দেখতাম, তা-ই করতে চাইতাম। মা 'এটা করিস্‌ না, ওটা করিস্‌ না' বলে শাসন করতেন। কিন্তু আব্বা সবকিছুতেই আমাকে উৎসাহিত করতে। তিনি ছিলেন একান্ত আপন- প্রাণবন্ধু। আব্বা প্রায়ই বলতেন, "পৃথিবীতে সব কাজ করা, দেখা, শোনা বৈধ। কিন্তু জেনেশুনে কারো কোনো ক্ষতি করা সম্পূর্ণ অবৈধ।" পিতৃবিয়োগ আমাকে সবচেয়ে মর্মাহত করেছিল। স্কুল ও খেলাধুলা ছাড়া বেশীর ভাগ সময় আমি আব্বার সাথে কাটাতাম। এ-জন্য "মা" ও খালা-ফুপুরা আমাকে 'বাপ-নেওটা' বলত। 'বাপ-

নেওটা’ শব্দটা সে সময় আমাকে ক্ষেপিয়ে তুলত, কিন্তু ভাবি ‘চিরকাল ঐ বিশেষণটা যদি শুন্‌তে পেতাম!

স্কুলের সাপ্তাহিক ছুটি বা দীর্ঘ বন্ধে আব্বা যেখানেই যেতেন, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। সার্জারীতে, বাজারে, প্রাতঃভ্রমণে— এমনকি শহরতলী থেকেও একটু দূরে গ্রামাঞ্চলে কোনও ভিজিটে গেলে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। আব্বার সাইকেলের পেছনের ক্যারিয়ারে বসে আমি যেতাম। দেখতাম, পথচারীদের অধিকাংশই আব্বার সাথে সালাম কুশলাদি বিনিময় করত। শীতকালীন প্রাতঃভ্রমণে আব্বা পথচারীদের সঙ্গে দু’দন্ড দাঁড়িয়ে যখন কথাবার্তা বলতেন, তখন তাঁর সাথে থাকতাম আমরা দুই সহোদর ভাই। আব্বার গায়ে থাকত ওভারকোট। আমাদের গায়ে শীতের কাপড় থাকলেও আব্বার ওভারকোটের মধ্যে লুকিয়ে পড়তাম। আব্বা বিষয়টা উপভোগ করতেন— তাঁর বিশাল দু’বাহু দিয়ে আমাদের দু’ভাইকে জড়িয়ে ধরে। আমরা উপভোগ করতাম আব্বার শরীরের উষ-তা। ঐ অল্প সময়ের মধ্যেও আমরা দুই ভাই চিম্‌টাচিম্‌টি ধাক্কাধাক্কি শুরু করে দিতাম। আব্বা মৃদু ধমক দিয়ে আমাদের থামিয়ে দিতেন।

ছুটির দিনে দিবানিদ্রা বা মাঝে মধ্যে রাত্রে আব্বার সঙ্গে কথা বলতে বলতে তাঁর বালিশেরই একপাশে মাথা রেখে শুয়ে পড়তাম। সকালে নিজেকে পেতাম আব্বার বুকের মধ্যে। আব্বা যখন চিরস্থায়ী রোগে শয্যাগত, “মা” তখন নানান সাংসারিক কাজে ব্যস্ত। আমি আব্বার হাত-পা-বুকে তেল বা মলম মালিশ করতে করতে ঘুমিয়ে যেতাম। আব্বা ঘুমোতেন কিনা জানিনা, সূর্য ওঠার আগে আব্বা আমাকে উঠিয়ে দিতেন। বারান্দায় মাদুর পেতে আমরা সব ভাইবোন একসঙ্গে পড়তে বসতাম। আব্বা অনেক কষ্টেসৃষ্টে আমাদের কাছে এসে বসতেন ও আমাদের লেখাপড়ায় সাহায্য করতেন, তবে বেশীক্ষণ পারতেন না, বিছানায় ফিরে যেতেন।

আব্বার সঙ্গে আমার গভীর সুসম্পর্ক রাখার একটি স্বার্থগত কারণ ছিল। তিনি আমাকে ইঞ্জেকশন, টিকা, ব্যান্ডেজ করা— এমনকি প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন অনুযায়ী মিক্সচার বানানো শিখিয়ে দিয়েছিলেন। হয়তো তাঁর স্বপ্ন ছিল আমাকে ডাক্তারী পড়াবেন। আব্বা কোনো ভিজিটে গেলে কম্পাউন্ডার চাচা ও আমি থাকতাম সময় সময় ডাক্তারখানা পাহারায়। আবার কম্পাউন্ডার চাচা চা-বিড়ির জন্য পাঁচ-দশ মিনিটের জন্য বাইরে যেতেন। তখন এই আমি চাতকের জলপ্রার্থণার মতো ইঞ্জেকশন, টিকা বা ব্যান্ডেজের রোগীর আশায় পথ চেয়ে থাকতাম। কেননা, একটা ‘কেস্’ মিললেই গাঁটে চার আনা পয়সা চলে আসত। এ বেলায় পাঠকদের চুপিচুপি বলে রাখি, ঐ পয়সা খরচ হত ঝাল-বাদাম, ফটবল ম্যাচ্ দেখা কিংবা লুকিয়ে ছাপিয়ে মর্নিং শো সিনেমার পেছনে। আব্বা অসুস্থতাকালীন বাড়ীতে আসত রোগী সকাল-সন্ধ্যায়। আব্বা লিখতেন প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন, আমি হতাম কম্পাউন্ডার।

পাড়া-প্রতিবেশী ও দূর হতে আগত রোগীরা আমাকে 'ছোট ডাক্তার সাহেব' বলে সম্বোধন করত। আমার তা শুনতে ভালই লাগত। আব্বাও তা উপভোগ করতেন এবং উনিও মাঝেসাঝে 'ছোট ডাক্তার' বলে হাঁক ছাড়তেন।

আব্বা যখন জীবন সায়াহ্নের শেষ প্রান্তে উপনীত, আমি প্রায় প্রতিদিন, আব্বার কাছেই ঘুমিয়ে যেতাম। ঘুম ভাঙ্গলে খেয়াল করতাম, আমার মাথাটাকে আব্বা মৃদু চাপে তাঁর বুকের সঙ্গে জাপ্‌টে ধরে চুলে ইনুনি বিনুনি কাটছেন। আমিও বুকের মধ্যে নাক গুঁজে আব্বার গায়ের স্বর্গীয় সুবাস গ্রহণ করতাম। যা আজো আমার সন্তানদের আদরের সময় পেয়ে থাকি। আর আমার নাকে আজো লেগে আছে ''মা''-এর ''মা-মা'' গন্ধ। দুষ্টুমী করলে মা যখন আমাকে ধরতেন শাসন করতে, আমি উল্টো তখন মাকে জাপ্‌টিয়ে ধরতাম। ''মা'' দু'ঘা আমার পিঠে বসিয়ে দিয়ে বলতেন, ''আমাকে ছাড় বলছি!'' আমি বেশ বুঝতাম, ওটা ছিল তাঁর কপট রাগ। আমি মা-কে আরো বেশী করে জড়িয়ে ধরতাম। উদ্দেশ্য, ''মা''-এর গন্ধ নেয়া। রান্নাঘরের কাঁচা-পাকা মশলা ও ''মা''-র গায়ের গন্ধমিশ্রিত সে সুগন্ধের বর্ণনা দেওয়া আমার পক্ষে কোনো ক্রমেও সম্ভব নয়। গুরু কবি-লেখকরা হয়তো তাঁদের কোনো রচনায় লিখে গেছেন, অথবা আগামীতে হয়তো কেউ লিখবেন।

ছায়াছবি বা সিনেমার প্রতি আব্বার তেমন আগ্রহ ছিল না। আম্মার ছিল। ''মা'' মাঝে মধ্যে খালা-ফুপু বা আমাদের নিয়ে সিনেমা দেখতে গিয়েছেন। আমার জীবনের প্রথম ছবি আমি মহিলাদের সংরক্ষিত আসনে বসেই দেখি। সে ছবিটি সম্ভবতঃ দিলীপকুমার বা উত্তমকুমার অভিনীত ছিল। আব্বার ছিল গানের প্রতি গভীর আগ্রহ। তা শহরকেন্দ্রিক গান নয়। তা ছিল জারী-সারী, ভাটিয়ালী, মুর্শিদী-মারফতী, ইত্যাদি। মাঝে মধ্যে আব্বা বয়াতী ঢঙ্গে গেয়েও উঠতেন। আব্বা বলেছিলেন, তাঁর একমাত্র চাচা যাঁর জন্মস্থান গাজনার বিল এলাকায়, দশ-বিশ গ্রামের খ্যাতনামা বয়াতী ছিলেন। আমার দাদাবাড়ী এখনও মানুষের কাছে 'বয়াতী বাড়ী' হিসাবে পরিচিত। ঐ একই পথ ধরেছিলেন আব্বার এক ভাতিজা। উনারা পাঁচ ছ'জন মিলে বয়াতী দল গঠন করে গ্রামেগঞ্জে 'খ্যাপ' মারতেন। আমার মনে গভীর দাগ কেটে আছে আয়ুব খানের মারশাল ল'-এর প্রথম দিকে, আমাদের বাড়ীতে, আমার সেই চাচাতো বড়ভাই 'আহাদ আলী বয়াতী' দলবলসহ এসে গান করেছিলেন। বাড়ীর উঠোন ভরে গিয়েছিল প্রতিবেশীসহ আত্মীয়স্বজনে। আমাদের সে কি আনন্দ! সারা রাত ধরে গান হয়েছিল। পিঠাপুলি, মুড়ি-মুড়কি, চা-পান-সুপারী সরবরাহে ব্যস্ত ছিলেন ''মা''-খালা-ফুপুসহ প্রতিবেশী চাচী আর ভাবীরা। চাচাতো বয়াতী ভাই আমাকেও তাঁর বাঁধানো একটি বয়াতী গান শিখিয়ে দিয়েছিলেন। আমিও গেয়েছিলাম।

ঐ অনুষ্ঠানের পর আমাদের বাড়ীতে এক দুর্যোগ নেমে আসে। আব্বা ছিলেন আয়ুবী সামরিক শাসনের ঘোর বিরোধী। তাঁর স্বরচিত একটি সামরিক শাসনবিরোধী গান বয়াতী ভাই গেয়েছিলেন। দু'দিন পর পুলিশ এসে আব্বাকে ধরে নিয়ে যায়। ডাক্তারখানা পুলিশ তছনছ করায় অনেক মূল্যবান জীবনরক্ষাকারী ঔষধ নষ্ট হয়ে যায়। জেলা শহরের সিভিল সার্জনসহ সব ডাক্তার মিলে আব্বার জামিনের ব্যবস্থা করলেও আব্বাকে তিনদিন হাজতবাস করতে হয়। তখন থেকেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। আব্বা যখন শয্যাগত, শুয়ে শুয়ে ঐ জারীটি বার বার গাইতেন।যদিও সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে কিছু না বলার সামরিক ফরমান ছিল, ''দেওয়ালেরও কান আছে, মার্শাল ল'-র বিরুদ্ধে কিছু বলবেন না।''

আব্বা তবুও গাইতেন। তাঁর অসুস্থ শরীরেরসমস্ত শক্তি দিয়ে , জোর করে, উচ্চস্বরে। কৈশরে

আব্বার স্বরের সঙ্গে স্বর মিলিয়ে আমিও সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, বাংলার স্বাধিকার আন্দোলন শেখ মুজিবের ৬ দফায় একজন রাজনৈতিক যোদ্ধা হিসেবে যোগদান করেছিলাম, জেলা শহরের বিশিষ্ট যুবনেতা আহমেদ রফিকের হাত ধরে।

“মা”-এর আশির্বাদ, স্নেহ, ভালবাসা, আদর, বকুনি চার দশকেরও বেশীকাল ধরে আমার ভাগ্যে জড়িয়ে ছিল। কিন্তু আব্বাকে যখন আমাদের কাছ থেকে প্রকৃতি ডেকে নিয়ে গেল, তখন আমি সিটে বসে সাইকেল চালাতে শিখিনি। আব্বার প্রাণহীন দেহটাকে যখন গোসল করানো হচ্ছিল, তখন আমরা সব ছোট ভাইবোন মিলে উচ্চ স্বরে কাঁদছিলাম। প্রতিবেশীরা সবাই আমাদের সান্ত্বনা দিচ্ছিল। পাড়ার বড় আকবর ভাই আমাকে প্রায় জাপ্‌টে ধরে তুলে নিয়ে গিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন আমাকে বাই-সাইকেল সিটে বসে চালানো শেখাতে। সাময়িকভাবে ভুলে গেলাম পিতৃবিয়োগের দুঃখ। সিটে বসে সাইকেল চালানো শেখাই সেদিন হয়ে গেল আমার কাছে মুখ্য বিষয়। আমরা সম্বিত ফিরে পেলাম, যখননেক মানুষ তক্‌বির দিয়ে খাটিয়া কাঁধে তুলে নিয়েছে।

আব্বার রেখে যাওয়া সেই সাইকেলটিই পরবর্তীকালে হয়ে গিয়েছিল আমাদের পারিবারিক যানবাহন। প্রকৃতি হয়তো আব্বাকে নিয়ে গেল, কিন্তু আকবর ভাইকে দিয়ে আমাকে সাইকেল সিটে বসে চালাতে শেখাল। যার চালক ও নিয়ন্ত্রক হয়ে পড়লাম আমি। হাট-বাজার সারা, রেশন তোলা, গম পেষা, ছোট ভাইবোনদের সামনে পেছনে বসিয়ে এদিক-সেদিক যাওয়া, এমনকি প্রতিবেশী সজ্জনদের ফাই-ফরমায়েশেও ব্যবহার হত ঐ সাইকেল। আমার কৈশর ‘বাজার সরকার’ পদবীতে আচ্ছাদিত হয়ে গেল। দুঃখ আর হতাশায় গান সঙ্গে রইল অগত্যা, পাঠ্য-পুস্তক হয়ে গেল দূর সম্পর্কের আত্মীয়। (চলবে)

মিজানুর রহমান তরুন, সিডনী, ২৬/০৬/২০১১

লেখকঃ অস্ট্রেলিয়াতে বসবাসকারি একমাত্র বাংলাদেশী মুক্তিযোদ্ধা, কন্ঠ–উপাসক শিল্পী, এবং রুচিশীল ও সাংস্কৃতিমনা একজন রেডিও ব্যক্তিত্ব